শিক্ষানীতি, ২০২০—প্রণয়নকথা

সৌরীন ভট্টাচার্য

ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি ২০২০, এই শিরোনামে ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের তরফে একটি দলিল প্রকাশিত হয়েছে। এর আগে ড্রাফট ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি ২০১৯, এই নামে একটা খসড়া শিক্ষানীতি প্রকাশ করা হয়েছিল মন্ত্রক থেকে। উদ্দেশ্য ছিল খসড়া নিয়ে দেশের লোকেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা হোক। কিছু হয়েও ছিল। খুব বেশি তেমন করে হয়তো হয়নি। সে আলাদা কথা। তবে খসড়া স্তরে এইবারের এই নীতি নিয়ে যা কথাবার্তা হয়েছিল তা থেকে মোটামুটি একটা আন্দাজ অনেকের গড়ে উঠেছিল। ফলে চূড়ান্ত চেহারায় এই নীতি যখন আমাদের হাতে এল তখন আমাদের একেবারে চমকে ওঠার কোনো কারণ ছিল না। এর কাঠামো নিয়ে ততদিনে সাধারণ মানুষের মনে একটা ধারণা অবশ্যই তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

যে কমিটি এই খসড়া প্রণয়ন করেছিল তার অধ্যক্ষ ছিলেন বিজ্ঞানী কে কস্তুরীরঙ্গন। তিনি আমাদের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইসরো (ISRO)-র প্রাক্তন অধ্যক্ষ। তা ছাড়া তিনি রাজ্যসভার একজন মনোনীত প্রাক্তন সদস্য। বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি যুক্ত ছিলেন বেঙ্গালুরুর রামান রিসার্চ ইন্সটিটিউটে। খসড়া কমিটিতে আরও দশ জন সদস্য ছিলেন। তাঁরা হলেন বসুধা কামাত, কে জে আলফোঁস, মঞ্জুল ভার্গব, রামশঙ্কর কুরীল, টি ভি কাট্টিমণি, কৃষ্ণমোহন ত্রিপাঠী, মাঝহর আসিফ, এম কে শ্রীধর, রাজেন্দ্রপ্রতাপ গুপ্তা, শাকিলা টি শামসু (সদস্য সচিব)। অধ্যক্ষ ও সদস্য সচিবকে বাদ দিয়ে সদস্য সংখ্যা নয়। তার মধ্যে দু-জন খুব বেশিদিন কমিটির সঙ্গে ছিলেন না। কে জে আলফোঁস ২০১৭-র সেপ্টেম্বর থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে যোগ দেবার জন্য এই কমিটির কাজ থেকে সরে যান। রাজেন্দ্রপ্রতাপ গুপ্তা ছিলেন কো-অপ্ট করা সদস্য। তিনি ২০১৭-র ডিসেম্বরে পদত্যাগ করেন। তাহলে

রইলেন সাতজন। এই সাতজনের মধ্যে দু-জন — কৃষ্ণমোহন ত্রিপাঠী ও এম কে শ্রীধর, ছিলেন শিক্ষা আধিকারিক। কৃষ্ণমোহন মাধ্যমিক শিক্ষার অধিকর্তা এবং উত্তরপ্রদেশ হাই স্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা বোর্ডের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। আর এম কে শ্রীধর ছিলেন কর্ণাটক নলেজ কমিশনের প্রাক্তন সদস্য সচিব। বাকি পাঁচজনের মধ্যে তিন-জন — বসুধা কামাত, রামশঙ্কর কুরীল ও টি ভি কাট্টিমণি, ছিলেন প্রাক্তন উপাচার্য। বসুধা কামাত এস এন ডি টি উইমেন্স ইউনিভার্সিটি, রামশঙ্কর কুরীল মধ্যপ্রদেশ বাবাসাহেব অম্বেডকর ইউনিভার্সিটি অব্ সোশাল সায়ান্সেস এবং টি ভি কাট্টিমণি মধ্যপ্রদেশ ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ট্রাইবাল ইউনিভার্সিটি। দু-জন ছিলেন সরাসরি অধ্যাপনাতে। মঞ্জুল ভার্গব প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক আর মাঝহর আসিফ জবাহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর পার্শিয়ান অ্যান্ড সেন্ট্রাল এশিয়ান স্টাডিজের অধ্যাপক।

ভারত সরকারের তরফে এই শিক্ষানীতির খসড়া প্রণয়ন করার কমিটি যখন তৈরি করা হয় তখন আমাদের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী ছিলেন প্রকাশ জাওড়েকার। ২০১৮ সালের ১৫ ডিসেম্বরে এই খসড়া মন্ত্রীর কাছে পেশ করা হয়। সেই খসড়া প্রতিবেদনের শুরুতে আমরা পাই মন্ত্রীর এক বার্তা। সেই বার্তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, সে সময়ে ভারতের জনসংখ্যার অর্ধেক মতো লোকের বয়স ছিল ২৬ বছরের নীচে। এও বলা হয় যে, ২০২০ সালের হিসেব অনুসারে ভারতই হবে পৃথিবীর তরুণতম দেশ। আমাদের জনসংখ্যার মিডিয়ান বয়স তখন হবে ২৯। এই তরুণ জনসংখ্যার জন্যে শিক্ষা হল 'ন্যাশনাল এজেন্ডা'। একটা জাতীয় কর্মসূচি। মন্ত্রীর বার্তা অনুসারে এই কর্মসূচিই আমাদের 'সন্তান ও যুবকদের ভবিষ্যতের রূপান্তর সাধন করার জন্য' অনুঘটকের কাজ করবে। তাহলে এটুকু বলা চলে যে, আমাদের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শিক্ষা ব্যাপারটাকে তখন ভাবছিলেন অন্য কোনো উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য একটা পন্থা। কোনো সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে শিক্ষা যে নিজেই কোনো লক্ষ্য হয়ে উঠতে পারে, এমন কোনো ধারণা তাঁর মাথায় কাজ করছিল বলে মনে হয় না। যে লক্ষ্য সাধনের জন্য শিক্ষা জরুরি, সে লক্ষ্য হয়তো খুব মহৎ, কিন্তু মন্ত্রীর চিন্তা অনুযায়ী তা আংশিক, কেননা তা জনসংখ্যার অর্ধেকের জন্য ওই কাঙ্ক্ষিত রূপান্তর সাধনে সচেষ্ট। বাকি অংশ, যে-অংশ হয়তো তত তরুণ নয় তাদের কি হবে তা এখান থেকে জানা যাবে না। এখানেই ওই ন্যাশনাল এজেন্ডা কথাটা নিয়ে আমাদের খটকা। ন্যাশনাল হতে গেলে নেশনের কথা ভাবতে লাগে। নেশনের মধ্যে তো যাঁরা তরুণ নন তাঁরাও আছেন। রাষ্ট্রের মনোযোগ তরুণদের উপরে নিবদ্ধ। তাঁরা রাষ্ট্রের কাজে লাগতে পারেন, বা তাঁদের রাষ্ট্রের কাজে লাগানো যেতে পারে। শিক্ষা সেখানে কী ভূমিকা নিতে পারে সেটাই এই শিক্ষানীতির বিচার্য। কাজেই মন্ত্রীর চিন্তা চৌহদ্দিতে জাতির শিক্ষার কথা নেই। রাষ্ট্র শিক্ষাকে কেমনভাবে কাজে লাগাবার চিন্তা করছে তার কিছু হদিশ এখানে মিলতে পারে।

এই কাজে লাগাবার ভাবনাটা মন্ত্রী বেশ পরিষ্কার করেই বলছেন। আমাদের জনসংখ্যায় তরুণের সংখ্যাধিক্য। এই সুবিধাটা আমাদের গ্রহণ করা উচিত ও তার থেকে উপযুক্ত ফায়দা তোলাও দরকার। মন্ত্রীর মূল বাক্য উদ্ধার করছি। "To reap the benefits of this demographics, our Government under the stewardship of our able Prime Minister had promised that it will implement a National Education Policy to meet the changing dynamics of the population's requirements with regards to quality education, innovation and research, aiming to make India a knowledge superpower by equipping its students with the necessary skills and knowledge and to eliminate the shortage of manpower in science, technology, academics and industry." এই বাক্যের শুরুতেই আমরা জানতে পারছি যে, আমাদের জনসংখ্যাগত সুবিধার সুযোগ নেবার জন্য আমাদের 'সমর্থ' প্রধানমন্ত্রী একটি ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দেশের শিক্ষানীতি কোনো রাজনৈতিক দলিল নয়। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী যখন সেই দলিল নিয়ে কোনো কথা বলেন তখন তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবে কথা বলেন না। মান্য ভাষারীতি অনুসারে 'Hon'ble Prime Minister' রাজনীতি নিরপেক্ষ সম্মানসূচক বর্ণনা বলে গণ্য। 'able Prime Minister' রাজনৈতিক মূল্যায়নের দ্যোতক। এই দলিলে ওই বিশেষণ বেমানান। ভাষাশৈলীর কথা থাক। এই বাক্যের পরের অংশে আমরা জানতে পারি যে, আমাদের দেশের তরুণ জনসাধারণের উঁচু মানের শিক্ষা, আবিষ্কার ও

গবেষণার যে-প্রয়োজন তার লক্ষ্য হল ভারতকে এক 'নলেজ সুপারপাওয়ার'-এ পরিণত করা। এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানশক্তিতে রূপান্তরিত করতে গেলে আমাদের ছাত্রদের হাতে তুলে দিতে হবে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞান। তাহলে প্রধানমন্ত্রী যে ধরনের ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার চরিত্র খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে। তার চরম লক্ষ্যের কথাও মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী একরকম করে বললেন।

এই সঙ্গে বর্তমান শিক্ষানীতির আরও একটা উদ্দেশ্যের কথা মন্ত্রী বলেছেন। সেটা হল বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিক্ষাক্ষেত্র ও শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের যত লোক প্রয়োজন তার তুলনায় যে ঘাটতি আছে তা পূরণ করা। এই দুই অংশ মিলিয়ে শিক্ষানীতির যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মন্ত্রীর কথা থেকে আমরা পেলাম, তাকে কি কোনো অর্থে আমরা জাতীয় লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বলতে পারি? জাতি বলে যেকোনো ধারণাই আমরা ধরে নিই না কেন, তাতে দেশের অনেক মানুষ, বেশির ভাগ মানুষ, হয়তো-বা সব মানুষকেই তো থাকতে হবে। তাই যদি হয় তাহলে প্রশ্ন উঠবেই আমাদের মন্ত্রী যেসব উদ্দেশ্যের কথা বলছেন তা কি কখনো কোনো জাতির ভাবনার বিষয় হতে পারে? জাতি কি সত্যিই নলেজ সুপারপাওয়ার হবার জন্যে খুব মাথা গরম করে। দেশের কোন্ ক্ষেত্রে কত ম্যানপাওয়ার ঘাটতি আছে তা নিয়ে কি জাতির মাথাব্যথা থাকে? একটু ভাবলেই বোঝা যাবে এই ব্যাপারগুলো সবই আসলে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মন্ত্রী রাষ্ট্রিক ভাবনাকে জাতির উপরে চাপাচ্ছেন। 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র বদলে 'সমর্থ প্রধানমন্ত্রী' সম্ভবত তারই প্রতীকী প্রকাশ।

এই শিক্ষানীতিতে ভাবনার ভরকেন্দ্র কোন্ দিকে সরছে তা মন্ত্রীর এই বার্তাপত্রের মধ্যেই বেশ পরিষ্কার। বস্তুত, ২০২০-র চূড়ান্ত নীতির পিছনে আছে ২০১৯-এর খসড়া শিক্ষানীতি। তারও আগে আছে একটা বিস্তৃত আলাপ আলোচনার পর্ব। সেই আলোচনার স্তরে কারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন? মন্ত্রীর ভাষায় সেই সহযোগিতামূলক আলোচনার চরিত্র ছিল "unprecedented collaborative, multi-stakeholder, multi-pronged, bottom-up people-centric, inclusive, participatory consultation process"। একটু খেয়াল করলে সকলেই বুঝতে পারবেন যে, এইসব শব্দবন্ধের প্রত্যেকটাই বর্তমানে সরকারি স্তরে বাঁধা বুলি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্টেকহোল্ডার কথাটা করপোরেট ক্ষেত্র থেকে বর্তমানে প্রায় সর্বত্র বেমালুম ছড়িয়ে গেল। কোনো কোম্পানিতে আমি যখন টাকা খাটাই সেখানে সেই বিনিয়োগ আমার স্টেক। আমি তখন সেই কোম্পানিতে একজন স্টেকহোল্ডার। এইভাবে মানে দাঁড়িয়ে গেছে যে-কোনো ব্যাপারে আমার যদি কোনো আগ্রহ বা গরজ থাকে তাহলেই আমি স্টেকহোল্ডার হয়ে যাই। শিক্ষাও এখন সকলেই জানেন অনেক বিনিয়োগের ক্ষেত্র। এইসব ভাষাপ্রয়োগে তা মালুম হচ্ছে। তেমনি আমরা বর্তমানে সমস্ত প্রকল্পেই বহুমুখী প্রচেষ্টা নিয়ে থাকি। সেই অর্থে তা 'multi-pronged'। এইভাবে এখনকার যাবতীয় সরকারি বুলি এই একটা জায়গায় এক বাক্যে জড়ো করা হয়েছে। তা এই ব্যাপক আলোচনার আয়োজন শুরু হয়েছিল ২০১৫ থেকে। আর তার আয়োজক ছিলেন আমাদের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। মন্ত্রীর ভাষায় এই ব্যাপক আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল বিভিন্ন স্তরে। আলোচনার ব্যাপকতা এতই বেশি ছিল যে, মন্ত্রী তাঁর বর্ণনায় 'humungous' শব্দটা ব্যবহার করেছেন। এই অর্বাচীন শব্দের মধ্যে 'huge' এবং 'monstrous' এই দুটো শব্দই আছে। অর্থাৎ আলোচনার প্রকৃতির মধ্যে খানিকটা যেন ধামাকা চরিত্র ছিল, এইরকম বোধহয় মনে করা যেতে পারে। যত স্তরে আলোচনার কথা বলা হয়েছে তাতে এই ধামাকার ধারণা কিছু অস্বাভাবিক নয়। অনলাইন ছাড়াও ছিল গ্রাম, ব্লক, শহরের স্থানীয় প্রশাসন, জেলা, রাজ্য, এবং শেষ পর্যন্ত একেবারে জাতীয় স্তর। মন্ত্রী দাবি করছেন যে এইভাবে সমস্ত নাগরিক এই ব্যাপক আলোচনায় অংশ নেবার সুযোগ যাতে পান তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সবাই বুঝবেন যে এগুলো মোটামুটি কথার কথা। মন্ত্রী এইসঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে, "Several in-person and in-depth deliberations across a wide spectrum of stakeholders were held". খুবই সম্ভব। বর্তমানের বিনিয়োগমুখী ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রের কিছু বাছা বাছা স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে হয়তো কেন, বলাই চলে নিশ্চয় কিছু গভীর আলোচনা হয়েছিল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি যাঁদের সঙ্গে কমিটির আলোচনা হয়েছিল তার একটা তালিকা ৭ নং সংযোজনে দেওয়া আছে। তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ্ আছে। আর কোনো দ্বিতীয় ছাত্রসংগঠন আছে বলে মনে হল না। সে যাই হোক। এত আলাপ আলোচনার পরে প্রাক্তন ক্যাবিনেট সেক্রেটারি অধুনা প্রয়াত টি এস আর সুব্রহ্মণ্যন-এর অধ্যক্ষতায় আর একটি কমিটি গড়ে দেওয়া হয়। তার নাম হল কমিটি ফর এভোলিউশন অব্ দ্য নিউ এডুকেশন পলিসি। নয়া

শিক্ষানীতির এভোলিউশনের জন্য কমিটি, এর মানে কী তা কে জানে। হয়তো এই এভোলিউশন স্টাডি করা এই কমিটির কাজ। ২০১৬-র মে মাসে এই কমিটি তার প্রতিবেদন জমা দেয়। এই প্রতিবেদনের উপরে ভিত্তি করে মন্ত্রক সরাসরি একটা নথি তৈরি করে। তার নাম সাম ইনপুট্স ফর দ্য ড্রাফ্ট্ ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি,২০১৬।

মন্ত্রী বলছেন এই স্তরে তিনি খসড়া প্রণয়ন করার জন্যে কমিটি তৈরি করে দিলেন। এই কমিটির দায়িত্ব হবে এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য ও পরামর্শ সব বিবেচনা করে একটি খসড়া প্রতিবেদন পেশ করা। মন্ত্রী জানাচ্ছেন যে কমিটি উৎসাহভরে এই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসায় তিনি কৃতজ্ঞ। তিনি আরও জানাচ্ছেন যে কমিটি এতই উৎসাহভরে এই কাজটা হাতে নিয়েছিলেন যে কমিটি এমনকি নিজের থেকেও কিছু আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন। মন্ত্রীর বাক্যাংশ হল কমিটি "even carried out its own consultations"। এই 'ইভেন' শব্দটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। মন্ত্রীর চিন্তায় কি এ কথা ছিল যে, কমিটির কাছে যেসব তথ্য ও পরামর্শ দেওয়া হল তার ভিত্তিতেই কমিটি একটা প্রতিবেদন রচনা করে দেবে। এই কমিটিকে কি গোড়া থেকেই স্বাধীন কমিটি হিসেবে ভাবা হয়নি? সারা দেশের শিক্ষাচিন্তার একটা রূপরেখা রচনার প্রশ্ন। বিশেষজ্ঞদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাঁরাই তো বুঝবেন কাদের সঙ্গে কথা বলা দরকার কিংবা কাদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। সরকারের সংগ্রহ করা এবং আলোচনা করা তথ্য ও পরামর্শের ভিত্তিতে এত গুরুত্বপূর্ণ একটা দলিল তৈরি করার চিন্তা কি স্বাস্থ্যকর? মন্ত্রীর ভাষায় "I am honoured to present to the children and youth of my country, the National Education Policy, 2018 built on the foundational pillars of Access, Equity, Quality, Affordability and Accountability"। আবার সেই বাঁধা বুলির গৎ। এ ছাড়াও মন্ত্রী এখন তো কেবল একটা খসড়া শিক্ষানীতি দিচ্ছেন দেশের মানুষকে। বলে ফেললেন বটে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, ২০১৮। উনি অবশ্য ঠিক দেশের মানুষকে দিচ্ছেন বলেও ভাবছেন না। উনি দিচ্ছেন দেশের শিশু ও যুব সম্প্রদায়কে। দেশের শিক্ষার ব্যাপারে দেশের আর কারও যে কোনো গরজ থাকতে পারে, এ কথাটা তেমন করে মনে আসে না। শিক্ষার প্রশ্নে যে-কেউ যে ওঁদের ভাষায় স্টেকহোল্ডার হতে পারে সে কথা আসলে খুব মাথায় থাকে না।

তা সংক্ষেপে এই হল আমাদের সরকারি মনোভাব। প্রতিবেদনটা খেয়াল করলে মনে হবে যে, সরকার একেবারে শক্ত হাতে এর রূপরেখা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছে। সাধারণভাবে এ কথা অবশ্য প্রায় সব সরকারি কমিটি সম্বন্ধেই সত্যি। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক বিবেচনায় সরকারের যে-ধরনের নীতি নির্ধারণ প্রয়োজন তার অনুকূল প্রতিবেদন পাওয়া সব সময়েই সরকারের দিক থেকে খুব কাম্য। কিন্তু কমিটিগুলো যেহেতু স্বাধীন কমিটি বলে বিবেচিত হয় তাই তাদের স্বাতন্ত্র্য দেখাবার মতো কিছু অবকাশও রেখে দিতে হয়। খুব প্রতিকূল প্রতিবেদন সরকারের পক্ষে বাস্তবত বলবৎ করা সুবিধাজনক হয় না। এসব কথা বুঝতে পারা কিছু শক্ত কাজ নয়। তবে তাই বলে প্রায় বলে কয়ে সরকারের চাহিদামতো একটা প্রতিবেদন রচনা করাও কোনো কাজের কথা হতে পারে না। তারই প্রতীকী চেহারা ওই অত পরিমাণ বাঁধা বুলির ব্যবহার। প্রতিবেদন পড়তে গেলে একটু অবাকই হতে হয় যে, মন্ত্রীর বার্তার মধ্যে ব্যবহৃত শব্দ 'হিউমাঙ্গাস' আবার ফিরে এসেছে খসড়া প্রতিবেদনের পঞ্চম সংযোজনে।

আরো একটা কথা। খসড়া প্রতিবেদনের আয়তন ৪৭৭ পৃষ্ঠা। পরবর্তী কালের মূল অংশের আয়তন মাত্র ৬৫ পৃষ্ঠা। বোঝাই যাচ্ছে এটা নেহাতই সারাংশ। কেউ যদি খসড়া না পড়ে সরাসরি একেবারে মূল প্রতিবেদন পড়বেন বলে ভাবেন, তাহলে তিনি কিন্তু এই কমিটির রকমসকম বা তার কাজকর্মের ধরনধারণ কিছুই বুঝতে পারবেন না। একটা কমিটির সব সদস্যদের নাম, তাঁদের সই, তাও এখান থেকে পাওয়া যাবে না। সে সবের জন্য যেতে হবে খসড়া প্রতিবেদনে। আসলে এই ৬৫ পৃষ্ঠার মূলের চরিত্র হল সাধারণত এই ধরনের প্রতিবেদনে যে অংশ সামারি অব্ রেকমেন্ডেশন্স নামে থাকে সেইরকম। সেরকম ভাবলে আবার অসুবিধা এই যে, এই সারাংশের কথা আর ওই খসড়াকে একই প্রতিবেদনের অংশ ভেবে নিলে দুই ভাগের মধ্যে বিষয়গত পুরো মিল পাওয়া যাবে না। গরমিলগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখানোর অবকাশ নেই এখানে। দু-একটা একটু খেয়াল করা যাক।

খসড়াতে শুরুতে আছে একটা বেশ বড়ো প্রিয়াম্বল। সারাংশের গোড়ায় আছে একটা ইন্ট্রোডাকশন। এমনিতে খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে খেয়াল করার মতো তফাত আছে। খসড়ার ভূমিকাংশে রীতিমতো একটা টেনশনের ছোঁয়া পাওয়া যায়। এই ভূমিকা কমিটির অধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত, বস্তুত লেখাটা

তাঁরই ব্যক্তি বয়ানে রচিত। আমি যেটাকে সারাংশ বলছি, অর্থাৎ যেটা কিনা মূল প্রতিবেদন, সেখানে সেরকম কিছু নেই। এই অংশে যে ছোটো ভূমিকা আছে সেখানে গালভরা আদর্শের কথা কিছু আছে। তা বড়ো ভূমিকার মুখবন্ধেও বেশ ছিল। কিন্তু সেখানে অন্য কথার মধ্যে মিশে ছিল বলে ভারতকে আমরা যে আগামী দিনে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম শক্তি হিসেবে দেখছি সেকথা অত চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর মতো লাগে না। 'leadership on the global stage in terms of economic growth', এই লক্ষ্যের কথা দ্বিতীয় বাক্যেই এসে গেছে। আসলে সারাংশের এই ভূমিকা সরকারি দপ্তরের লিখিত নথির মতো লাগে পড়তে। মোদ্দা কথা হল পৃথিবীকে টেক্কা দিতে হবে, তারই উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নে বসেছি আমরা। খুবই উপযোগবাদী একটা লক্ষ্য আমাদের সামনে, সেই লক্ষ্যসাধনে মানানসই উপযোগবাদী শিক্ষাব্যবস্থা চাই আমাদের। এসব প্রতিবেদন তারই আয়োজন। খশড়া ও মূল প্রতিবেদন দুইই যথেষ্ট বাগ্‌বহুল। নমুনা হিসেবে মূল প্রতিবেদনের ভূমিকা থেকে একটা বাক্য উদ্ধার করি। "Pedagogy must evolve to make education more experiential, holistic, integrated, inquiry-driven, discovery-oriented, learne-centred, discussion-based, flexible, and, of course, enjoyable." এর থেকে যার যা বোঝবার বুঝে নিতে হবে। এই শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হবে তা চরিত্র গঠনে সাহায্য করবে, শিক্ষার্থী সে শিক্ষার জোরে নৈতিক, যুক্তিবাদী, সংবেদনশীল ও যত্নবান ব্যক্তি হিসেবে বিকশিত হবে এবং একই সঙ্গে সে লাভবান চিত্তাকর্ষক কর্মসংস্থানের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তুলবে। রচনাশৈলীর আলোচনায় আর মন দেবার দরকার নেই। প্রতিবেদনের ধাঁচটা মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে আশা করি।

অধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত ভূমিকা থেকে যে টেনশনের আন্দাজ পাওয়া যায় বলছিলাম তা এই রকম। গোড়াতে তিনি ভেবেছিলেন যে ছ-মাসের মধ্যে কাজটা করে ফেলা যাবে, কেননা তাঁর ধারণা ছিল সুব্রহ্মণ্যণ কমিটি এবং ওই 'সাম ইনপুট্‌স' নথি ও আরো কিছু মালমশলার ভিত্তিতে তাঁদের একটা প্রতিবেদন খাড়া করে ফেলতে হবে। অর্থাৎ এই শিক্ষা কমিটির হাতে যেন তথ্যাদি সব সংগ্রহ করে দিয়েছে সরকার, কমিটির কাজ শুধু প্রতিবেদনটা লিখে ফেলা। কাজ আরম্ভ করে দেখা গেল ব্যাপারটা সেরকম নয়। তাই বলে সরকারের দেওয়া তথ্য সব জলে গেল তাও নয়।

এই স্তরে কমিটিকে একটা খসড়া কমিটির সাহায্যও নিতে হয়েছিল। চারজন সদস্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল এই খসড়া রচনা করার গোষ্ঠী। এই কমিটিতে ছিলেন অধ্যাপক মঞ্জুল ভার্গব, কে রামচন্দ্রণ, অনুরাগ বেহার এবং লীনা চন্দ্রণ ওয়াড়িয়া। মঞ্জুল ভার্গব মুলত বিদেশে থাকেন। তিনি এই গোষ্ঠীর কাজের জন্যে অনেকবার এসেছেন। তবে গোষ্ঠীর অন্য সদস্যদের চেয়ে তাঁর ভূমিকা আলাদা হওয়াই স্বাভাবিক। বাকি তিনজনের অধ্যাপকের চর্চাক্ষেত্রে আই টি শিল্প এবং তার প্রয়োগ একটা বড়ো ব্যাপার। এঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের কাজের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত। অধ্যাপক ভার্গব একালে গণিতের একজন স্বীকৃত প্রথম সারির ব্যক্তিত্ব। তবে বর্তমান কমিটির কাজে লীনা চন্দ্রণের ভূমিকা মনে হয় অন্যদের তুলনায় বেশি জরুরি ছিল। তিনি ছিলেন নয়া শিক্ষানীতির প্রণয়নে সিনিয়ার কনসাল্টান্ট। অব্‌জার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের এই বিজ্ঞানীর অন্যতম প্রধান গবেষণা ক্ষেত্র হল শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতি। নয়া শিক্ষানীতির খসড়া প্রণয়নে তাঁর ভূমিকা তাই জরুরি হওয়াই স্বাভাবিক। অনুরাগ বেহার আজিম প্রেমজি ফাউন্ডেশনের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ এবং আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। যেসব এনজিও আমাদের দেশে বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে এই ফাউন্ডেশন অবশ্যই তার মধ্যে অন্যতম প্রধান। তা ছাড়াও ওই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে তাঁর যে-বাস্তব অভিজ্ঞতা তা এই কমিটি অবশ্যই কাজে লাগাতে চাইবেন, এটা স্বাভাবিক।

এ ছাড়াও পিয়ার রিভিউয়ারদের একটা গোষ্ঠী ছিল। সেই গোষ্ঠীর সদস্যদের কাছ থেকেও শিক্ষা কমিটি প্রচুর ভাবনা চিন্তার খোরাক পেয়েছিল। এই পিয়ার গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন সাতজন সদস্য। এঁদের মধ্যে ছিলেন ফাউন্ডেশন ফর ডেমোক্রাটিক রিফর্মস-এর সাধারণ সম্পাদক, ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়ান্স-এর চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ আন্ড ট্রেনিং-এর প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ পাব্লিক ফিনান্স আন্ড পলিসির প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ব্রুহান মহারাষ্ট্র কলেজ অফ কমার্স ও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও উপাচার্য এবং মণিপাল গ্লোবাল এডুকেশনের বর্তমান চেয়ারম্যান।

এই ধরনের সব কমিটিতেই কাজে সাহায্য করার জন্য একটা সেক্রেটারিয়েট থাকে। এখানেও পাঁচ সদস্যের একটা সেক্রেটারিয়েট ছিল। তাঁরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আধিকারিক। মঞ্জুরি কমিশন উপরন্তু ন্যাক (NAAC)-এর মধ্যে একটা টেকনিকাল সেক্রেটারিয়েট স্থাপন করেছিল। সেই সেক্রেটারিয়েটে ছিলেন ন-জন সদস্য। লীনা চন্দ্রণ ওয়াড়িয়া এই সেক্রেটারিয়েটেও ছিলেন। চারজন ছিলেন বেঙ্গালুরুর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী। বাকি চারজনের তিনজন ছিলেন মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের আধিকারিক ও গবেষক। একজন ছিলেন কমিশনের গবেষক। এত বিস্তারে এই বিভিন্ন স্তরের সাহায্যকারী কমিটির আলোচনা কেন করা হল সে বিষয়ে একটু কথা বলা দরকার। আমাদের সরকারের নিয়োগ করা কমিটির কাজকর্মের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন যে, যদিও কমিটির স্বাধীন মতামতই সকলের কাছে প্রত্যাশিত, কিন্তু নানা ভাবে সে স্বাধীনতা বস্তুত ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে। সরকার থেকে যখন যে বিষয়ে কমিটি নিয়োগ করা হয়, তখন সে বিষয়ে সরকারি মনে এক রকমের একটা চিন্তা কাঠামো মোটামুটি দানা বেঁধে গেছে। বিশেষজ্ঞদের কমিটির কাছে অবশ্যই সে চিন্তা নির্দেশ আকারে আসে না। কিন্তু অলক্ষ নানা উপায়ে সে চিন্তা ভাবনার সঞ্চার করা সম্ভব। সেই সঞ্চার প্রক্রিয়ায় নানাভাবে নানা রকমের সংঘর্ষের পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে। সেই জন্যেই অনেক কমিটিতে অনেক সময়ে ভিন্ন মতের নোট থাকে বা তার প্রয়োজন পড়ে।

বর্তমান ক্ষেত্রে এই কমিটির কাজের পরিধির মধ্যে দুটি দিক পরিষ্কার ভাবে আলাদা করে নিয়ে চিন্তা করা দরকার। তার একটা হল শিক্ষাক্রম, তার বিভিন্ন স্তর, কোন্ স্তরে কত বছরের শিক্ষার আয়োজন ইত্যাদি। আমি আপাতত সে বিষয়ে কিছু বলছি না। কিন্তু অন্য আর একটি দিক যথেষ্ট গুরুপূর্ণ বলে বিবেচনা করা উচিত। সেটা এক ধরনের কেন্দ্রীকরণের ঝোঁক। আর তার সঙ্গে আছে 'ভারতীয়ত্ব'-এর ধারণাগত যোগ।

কেন্দ্রীকরণের ঝোঁক আজ নতুন নয়। আমাদের সাংবিধানিক কাঠামোয় যেটুকু ফেডারেল চরিত্র ছিল তা গোড়া থেকেই খুব দুর্বল। আমাদের রাজ্যগুলি কোনো অর্থে ঠিক প্রকৃত ফেডারেল রাজ্যের চেহারা পায়নি কোনোদিন। ভারতের জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যেই তার অনেক কারণ নিহিত। সে আলোচনায় গিয়ে এখন লাভ নেই। ১৯৪৭-এর ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যে দিয়ে আজকের ভারতের রাষ্ট্রিক সূত্রপাত। ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশ এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে তৈরি আজকের ভারত। আরও নানারকমের অদলবদলের মধ্যে দিয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের বর্তমান রাজ্য কাঠামো। সেই ১৯৩৫-এর ভারত সরকার আইনের সময় থেকেই আমাদের প্রাদেশিক সরকার আর কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে এক ধরনের ফেডারেল সম্পর্কের চিন্তা বর্তমান আছে। আবার এ কথাও ঠিক যে সেই ফেডারেল কাঠামো খুব মজবুত ছিল না কোনো দিনই। একটা কেন্দ্রানুগ টান বরাবরই বলবৎ ছিল। কালে কালে সেই ঝোঁক আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। নানা দিকে। সাংবিধানিক স্তর ছাড়াও আমরা সমাজ রাজনীতি ও অর্থনীতির অন্যান্য স্তরেও অনেক বেশি করে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছি। কেন্দ্রের দিকে টানের একটা স্বাভাবিক কারণ বাস্তব সুবিধা। বেশি করে রাজ্যমুখী হতে গেলে অনেক বেশি বৈচিত্র্যের মুখোমুখি হতে হয়। নানারকমের বিচিত্রের মুখ চেয়ে চলতে গেলে চলার অসুবিধা হতেই পারে। এক জনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে কাজ হাসিল করার দিক থেকে তা সুবিধাজনক হবারই কথা। আমাদের সাম্প্রতিকে জি এস টি এইরকমই এক কেন্দ্রানুগ ঝোঁকের বড়ো নজির। কত রাজ্যের কত রকমের কর ব্যবস্থা। ব্যাবসাপাতি, পরিবহন, চলাচল সব কিছুতে কত ঝক্কি ঝামেলা। গোটা দেশ জুড়ে একই রকমের জি এস টি। আমাদের সংবিধানে কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক ব্যবস্থার কথাও সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করতে হয়েছিল। রাতারাতি সেসব প্রায় অবান্তর হয়ে গেল। দরকার পড়লে এইসব পরিবর্তনের জন্য সংবিধান সংশোধনও করতে হয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও এরকম সংবিধান সংশোধন করতে হয়েছে। বড়ো রকমের সংশোধন অনেক আগেই করা হয়েছে। সংবিধানের সপ্তম তালিকা সংশোধনের মাধ্যমে ১৯৭৭-এর ৩ জানুয়ারি থেকে শিক্ষা যৌথ তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। তার আগে শিক্ষা ছিল রাজ্য তালিকায়। লক্ষণীয় যে কৃষি ও শিক্ষা দুইই ছিল রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবত আমাদের দেশের এত বৈচিত্র্যের কারণে সংবিধান প্রণেতারা কৃষি এবং শিক্ষার মতো বিষয়কে রাজ্যের এক্তিয়ারে রেখেছিলেন। আজ কেন্দ্রীকরণের টান লেগেছে সর্বত্র। শিক্ষা আনুষ্ঠানিক ভাবে যৌথ তালিকায় এসে গেছে। কৃষি এখনও আসেনি বটে, তবে দেয়াল লিখন যেন পড়া যাচ্ছে। এই মুহূর্তে যে কেন্দ্রীয় কৃষি বিল নিয়ে আন্দোলনকারী কৃষকেরা শীতের রাতে রাস্তায়

অবস্থান করছেন সে বিলের সাংবিধানিক বৈধতা এখনও কিন্তু যাচাই হয়নি।

কেন্দ্রানুগ টানের সাধারণ লক্ষণ মাথায় রাখলে বর্তমান শিক্ষানীতির দু-একটা সুপারিশের দিকে খেয়াল করা উচিত। আমি নেহাতই সাংগঠনিক সুপারিশের কথা বলছি। আমাদের যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আছে এখন তাও এক অর্থে এই রকম কেন্দ্রীকরণের প্রতীক। সারা দেশের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অনেকটা দায়িত্ব এই কমিশনের উপর বর্তেছে। নাম যদিও মঞ্জুরি কমিশন, কালে কালে এই কমিশন শিক্ষার পাঠক্রম সমেত উচ্চ শিক্ষার নানা ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের অধিকার পায়। বস্তুত আমাদের উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি ইতিমধ্যেই নিয়ন্ত্রণের বাড়াবাড়িতে অনেক সময়েই হাঁসফাঁস করে। এমনকি নানা যুক্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম নির্ধারণ করার ব্যাপারেও এই কমিশন রীতিমতো হস্তক্ষেপ করে। আর শিক্ষক পদের অনুমোদন এবং তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ ইত্যাদি ব্যাপারে মঞ্জুরি কমিশনের উপস্থিতি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। দিনে দিনে এই নিয়ন্ত্রণে আরও অনেক শাখা প্রশাখা যোগ হয়েছে। যেমন ন্যাক (NAAC)। প্রতিষ্ঠানগুলির মান নির্ধারণ এই ন্যাকের দায়িত্ব। ওই নির্ধারিত মানের ভিত্তিতে মঞ্জুরি করা অর্থের পরিমাণ নির্ভর করে।

বর্তমান প্রতিবেদনে নিয়ন্ত্রণের রীতিমতো বিস্তারিত পরিকল্পনার কথা নির্দেশ করা হয়েছে। পুরো চেহারা কী দাঁড়াবে তা এখনই বলা যায় না। তবে পরিকল্পনার মধ্যেকার ধাঁচটা কেমন ধরনের সেটা দেখে নেওয়া যেতে পারে। উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে বলা হচ্ছে সবার উপরে ছাতার মতো একটা সংগঠন থাকবে, তার নাম হায়ার এডুকেশন কমিশন অব্ ইন্ডিয়া (HECI)। ভারতের উচ্চ শিক্ষা কমিশনের আওতায় থাকবে চারটে আলাদা স্বাধীন সংগঠন। আলাদা আলাদা চার রকমের দায়িত্ব তাদের। নিয়ন্ত্রণ, মান নির্ধারণ, অর্থ মঞ্জুরি, এবং বিদ্যাগত মানবিচার। এই চার ভাগের মধ্যে মান নির্ধারণ বলতে এখন যে কাজটা ন্যাকের দায়িত্বে আছে সম্ভবত তাকেই বোঝানো হচ্ছে। তা যদি হয় তাহলে সে কাজের সঙ্গে বিদ্যাগত মানবিচারের কাজ প্রায় একই রকমের মনে হতে পারে। কীভাবে কতটুকু আলাদা করা হবে তা এখনই পরিষ্কার নয়। কিন্তু এই চার রকমের কাজকে আলাদা স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করার চিন্তা যে কমিশনের মাথায় আছে তা বেশ স্পষ্ট। তাই এই চার ভাগের কাজের জন্য চারটে আলাদা সংগঠনের প্রস্তাব রয়েছে। নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে তৈরি হবে ন্যাশনাল হায়ার এডুকেশন রেগুলেটরি কাউন্সিল (NHERC)। দ্বিতীয় কাজ মান নির্ধারণ। তার জন্য থাকবে ন্যাশনাল অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (NEC)। অর্থ মঞ্জুরির জন্য থাকবে তৃতীয় সংগঠন, হায়ার এডুকেশন গ্রান্টস কাউন্সিল (HEGC)। HECI-এর আওতাভুক্ত চতুর্থ সংগঠন হবে জেনারেল এডুকেশন কাউন্সিল (GEC)। তাহলে চারটি সমান্তরাল স্বাধীন সংগঠনের মাথায় থাকবে ছাতার মতো আর একটি সংগঠন। সাধারণভাবে খুব বেশি আমলাতান্ত্রিকতার চেহারা ফুটে ওঠে এই ধরনের ভাবনায়। তা ছাড়া আমাদের প্রশাসনের সাম্প্রতিক আর একটা ভাবনার সঙ্গে কাঠামোগত মিল খুবই লক্ষণীয়। সেটা হল আমাদের সামরিক বিভাগ পরিচালনায় এক নতুন পরিবর্তন। আমরা সবাই জানি আমাদের ছিল তিনটি স্বাধীন ও সমান্তরাল সামরিক বাহিনী। ফৌজি বাহিনী, নৌ সেনা ও বায়ু সেনা। এই তিন বাহিনীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ও সুনিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আর একটি ছাতা সংগঠন তৈরি করা হয়েছে। প্রথম বারের জন্য তার প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে জেনারেল বিপিন রাওয়াতকে, যিনি সদ্য তাঁর সামরিক বাহিনীর সাধারণ দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়েছেন। সব কিছু খুব কঠোর হাতে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণের ঝোঁক বেশ ফুটে উঠছে। আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান্তরাল সামরিক নিয়ন্ত্রণ স্বাস্থ্যের লক্ষণ কি?

গবেষণা ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও মানোন্নয়নের জন্য একটা ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন (NRF)-এর প্রস্তাব করা হয়েছে। তারও কাজ হবে সর্বতোভাবে গবেষণার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা। তার সঙ্গে অবশ্যই থাকবে নানা স্তরের সামঞ্জস্য বিধান। গবেষণার ক্ষেত্রে এত বেশি নিয়ন্ত্রণ ও সামঞ্জস্যের ভাবনা বিপজ্জনক। বিশেষ করে আমাদের জাতীয় জীবনের সাম্প্রতিক পর্বে 'ভারতীয়ত্ব'-এর ধারণা যেরকম জাঁকিয়ে বসছে তাতে ভয়ের কারণ অবশ্যই আছে। ভারতীয়ত্ব বলে একটা কাল্পনিক ধারণাকে সার্বিক করে তোলা এবং নানাবিধ প্রচার ও নিনাদকৌশলে তাকে প্রায় বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের জাতে তুলে ফেলা প্রকারান্তরে কর্তৃত্বপরায়ণ ও সামূহিক শাসনতন্ত্রের লক্ষণ। আমাদের সমাজ ও জাতীয় জীবনের গণতান্ত্রিক ধাঁচ কি আমরা বর্জন করতে চলেছি?